জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী
ও মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা উপলক্ষে বিশেষ ফিচার

কৃষক নেতা শেখ মুজিব

অজয় দাশগুপ্ত

তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মুসলিম লীগকে জমিদার-নবাব-খান বাহাদুরদের কব্জা মুক্ত করে জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য সচেষ্ট থাকেন। শিক্ষা জীবনের শুরুতে তিনি গোপালগঞ্জে এবং কলেজ জীবনে কোলকাতায় ছাত্র সংগঠন ও আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায় এসে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগ পুনর্গঠন করেন। একইসঙ্গে তিনি গণতান্ত্রিক যুবলীগ নামের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও চলতে থাকে।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ভাষা আন্দোলনের পুরোভাগে থাকেন তিনি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য কাজ করেন। হিন্দুরা যাতে দেশত্যাগ না করে, সে জন্য অনুরোধ করেন। সাহস দেন। একইসঙ্গে তাকে আমরা দেখি কৃষকের পাশে। তিনি ধানকাটা শ্রমিক বা দাওয়ালদের ন্যায্য দাবি আদায়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করার দাবি তোলেন। কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্যের বিষয়টি সামনে আনেন।

তাঁর আন্দোলন কৌশলও ভিন্ন। কেবল বিবৃতিদান ও ঘরে বসে আলোচনায় বিশ্বাস নেই। জেলা-মহকুমায় ঘুরে ঘুরে সংগঠন গড়ে তোলেন। জনসভায় ভাষণ দেন। প্রকৃত অর্থেই ছুটে বেড়ান গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক শহর থেকে আরেক শহরে।

তিনি কৃষকের পাশে কীভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, সেটা লিখে গেছেন 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে। গোয়েন্দা প্রতিবেদনেও আমরা পাই এর বিশদ বিবরণ। ফরিদপুর, ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলার কৃষক-দিনমজুরদের ধান কাটার জন্য খুলনা, বরিশাল, সিলেট প্রভৃতি জেলায় যেতে হতো। কাটা-মাড়াইয়ের জন্য ধানের যে ভাগ মেলে, নৌকায় তা বহন করে নিজ নিজ এলাকায় ফিরতেন তারা। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, এদের বলা হতো দাওয়াল। কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পর মুসলিম লীগ সরকার দাওয়ালদের ধানের নৌকা আটকাতে শুরু করল। বলা হতো, ধান সরকারের ভাণ্ডারে জমা না দিলে নৌকা ও ধান বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিভিন্ন স্থানে কৃষকদের কাছ থেকে পাকা রসিদ ছাড়াই ধান জমা হচ্ছিল। কিন্তু নিজ এলাকায় ফিরে তার বিনিময়ে কৃষকরা ধান পাচ্ছিল না। এভাবে দাওয়ালরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। [সূত্র : পৃষ্ঠা ১০৩-১০৪]

১৯৪৯ সালের ২৯ জানুয়ারি খুলনা থেকে পাঠানো এক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়, ২৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে খুলনা মিউনিসিপ্যাল পার্কে ঢাকা, ফরিদপুর ও কুমিল্লার প্রায় ৩৫০ জন কৃষকের সমাবেশে যোগ দেন। তিনি তাদের নিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাঙলোয় যান এবং ধানকাটার মজুরি বাবদ পাওয়া ধান নিয়ে নিজ নিজ বাড়িতে যাওয়ার পারমিট দাবি করেন। [গোয়েন্দা প্রতিবেদন, প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৮৯]

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহম্মাদ আলী জিন্নাহ-এর মৃত্যুর পর খাজা নাজিমুদ্দীন গভর্নর জেনারেল পদে আসীন হন। তিনি গোপালগঞ্জ সফরে যাবেন। সে সময়ে গোপালগঞ্জসহ আশপাশের এলাকায় দাওয়ালদের আন্দোলন চলছিল। 'জিন্নাহ ফান্ডে' অর্থ আদায়ের জন্য জোর জুলুমের অভিযোগও পাওয়া যেতে থাকে। এ দুটি ইস্যুতে আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং তার সামনের সারিতে রয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান। প্রশাসন ও মুসলিম লীগ নেতাদের অনেকে ধারণা করলেন, যেহেতু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির অনুসারী এবং খাজা নাজিমউদ্দীনের বিরোধী, এ কারণে তিনি গভর্নর জেনারেলের সফরের সময় বিক্ষোভ দেখাবেন। কিন্তু তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। সকলকে অনুরোধ করেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানকে স্বাগত জানাতে। একইসঙ্গে খাজা নাজিমুদ্দীনের কাছে এলাকার সমস্যা তুলে ধরতে ভুললেন না- 'গোপালগঞ্জ শহরে কলেজ চাই। দাওয়ালদের সমস্যার সমাধান চাই'।

১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নর্থ লক্ষ্মীপুর থেকে রফিক নামের একজন বঙ্গবন্ধুকে ইংরেজিতে চিঠি লিখেছিলেন, সম্বোধন ছিল 'মাই ডিয়ার মুজিব'। গোয়েন্দাদের নিঁখুত তৎপরতার কারণে চিঠিটি প্রাপকের হাতে পৌঁছায়নি। ১২ মার্চ এটি ঢাকার জিপিও থেকে হস্তগত হয় গোয়েন্দাদের। চিঠিতে লেখা হয়েছিল- 'আশা করি, ধানকাটা দাওয়ালদের নিয়ে একটি সমাবেশ করার বিষয়ে আপনার প্রতিশ্রুতির কথা মনে আছে। আমি আশুগঞ্জের কাছে লালপুর নামক স্থানে আগামী ১৪ মার্চ সোমবার একটি সমাবেশের আয়োজন করেছি। আমি আপনার নাম করে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছি এবং মানুষ আপনার কথা শুনতে আসবে। সুতরাং আপনাকে সমাবেশে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনি না থাকা মানে সবকিছু বরবাদ হয়ে যাওয়া। আমি চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরীকেও দাওয়াত দিয়েছি। তিনি উপস্থিত থাকবেন বলে কথা দিয়েছেন।'

চিঠিটি গোয়েন্দারা মেরে দিয়েছেন। এর সূত্র ধরে পুলিশি তৎপরতা বেড়ে যায়। তবে বঙ্গবন্ধুর লালপুর যাওয়া আটকানো যায়নি। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে তিনি কুমিল্লার দাওয়ালদের পক্ষে দৃঢ় অবস্থানের কথা জানিয়েছেন। সে সময়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুমিল্লা জেলার মহকুমা ছিল। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ সূত্রে আমরা জানতে পারি, তিনি রফিকুল হোসেনের আমন্ত্রণে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার নবীনগরে কৃষ্ণনগর হাইস্কুলের দ্বারোদঘাটন সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আরও ছিলেন ফুড ডিপার্টমেন্টের ডিজি এন এম খান সিএসপি এবং আব্বাসউদ্দিন আহম্মদ, সোহরাব হোসেন ও বেদারউদ্দিন আহম্মদ। শেষের তিনজন খ্যাতিমান সঙ্গীত শিল্পী। সমাবেশে তিনি এন এম খানকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনি একবার বিবেচনা করে দেখবেন এই দাওয়ালদের অবস্থা এবং কী করে বাঁচবে এরা। সরকার তো খাবার দিতে পারবে না- যখন পারবে না, তখন এদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছেন কেন? দাওয়ালদের নানা অসুবিধের কথা বললাম...'।

-২-

১৯৪৮ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। এ উপলক্ষে তিনি পাকিস্তান 'প্রতিষ্ঠা দিবস : ছাত্রসমাজের কর্ত্তব্য' শীর্ষক একটি বিবৃতি প্রদান করেন, যা ১৩ আগস্ট দৈনিক ইত্তেহাদ প্রকাশ করে। এতে শেখ মুজিবুর রহমানের পরিচয় দেওয়া হয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও অধুনা বিলুপ্ত প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে। তিনি পাট, তামাক শুপারির ওপর নতুন ট্যাক্স আরোপের সমালোচনা করেন। বিনা খেসারতে জমিদারি বিলোপের ওয়াদা খেলাপ করার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, মুসলিম লীগ সরকার জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের পঞ্চাশ ষাট কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।

গোয়েন্দা সূত্র জানায়, ১৯৪৮ সালের ৭ মে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জের টাউন ময়দানের সমাবেশে জমিদারি প্রথা বাতিলের দাবি জানান। গোয়েন্দাদের আরেক প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৪৮ সালের ৬ জুন নরসিংদী, ১৯৪৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ঘোষেরচরে এবং ২০ ফেব্রুয়ারি মাদারিপুরের সমাবেশেও একই দাবি উত্থাপন করেন। পাট ব্যবসা জাতীয়করণের দাবিতেও তিনি সোচ্চার।

টানা প্রায় আড়াই বছর কারাগারে থাকার পর ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে বঙ্গবন্ধু মুক্তিলাভ করেন। ততদিনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারির মহান আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ক্রমেই জনপ্রিয়তা ও দৃঢ়ভিত্তি লাভ করছে। তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছে এ সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব। ২১ মে তিনি পশ্চিম পাকিস্তান সফরে যান। প্রধান উদ্দেশ্য, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান। কেন বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে, সে বিষয়ে পাকিস্তানের ওই অংশের জনমত পক্ষে আনার বিষয়টিও বিবেচনায় ছিল। তবে বাংলার কৃষকের দাবির কথা তুলতে ভোলেননি। ৩০ মে তিনি রাজধানী করাচিতে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। সাংবাদিকদের বলেন, 'পাট পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান অর্থকরী ফসল।

পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যের ৭৫ শতাংশই এ পণ্যের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু ইস্পাহানির মতো অসাধু ব্যবসায়ী ও মুসলিম লীগের দালালদের লোভের কারণে পাটচাষীরা নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। মুসলিম লীগ সরকারের আত্মঘাতী নীতির কারণে আরও দুটি অর্থকরী ফসল পান ও তামাক চাষীদেরও দুর্দশার শেষ নেই'।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ফিরে তিনি জুলাই মাসে আওয়ামী মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটির সভা ডাকেন, যেখানে পাটচাষীদের সমস্যা বিশেষভাবে আলোচিত হয়। সভার প্রস্তাবে বলা হয়, জাতীয়করণই পাট সমস্যার সমাধান দিতে পারে।

১৯৫২ সালের ১৬ আগস্ট বঙ্গবন্ধু রংপুর শহরের জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি পাটের মণ সরকার নির্ধারিত ১৬ টাকার পরিবর্তে ৩০ টাকা করার দাবি জানান। গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়, সভার প্রথম তিনটি প্রস্তাব ছিল পাট সংক্রান্ত। একটি প্রস্তাবে পাটের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত পাটচাষীদের দেওয়া ঋণ আদায় স্থগিত রাখার দাবি জানানো হয়। পরের দিন দিনাজপুরের সমাবেশেও তাঁর ভাষণের মূল ইস্যু পাট। ১৮, ১৯ ও ২০ আগস্ট তিনি বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনায় জনসভা ও কর্মী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। গোয়েন্দা প্রতিবেদন সূত্রে আমরা জানতে পারি, তিনি ৩০ আগস্ট বরিশাল এবং ৭ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া ও পাবনায় সফর করেন। প্রতিটি সমাবেশেই পাটশিল্প জাতীয়করণের দাবি তোলা হয়। লালদিঘী ময়দানের সমাবেশে পাকিস্তান সরকারের পাটনীতির সমালোচনা করেন।

আমরা দেখতে পাই, তিনি কেবল রাজনৈতিক বক্তব্যে সীমিত থাকেননি- কৃষকদের দাবি সামনে এনেছেন। আর এটা করার জন্য তিনি চলে গিয়েছিলেন জেলা-মহকুমা-থানা এমনকি গ্রাম পর্যায়ে, যেখানে কৃষকদের বসবাস ও কাজের ক্ষেত্র।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র-তরুণদের পাশাপাশি কৃষক-দিনমজুরদের অবদান অনন্য। বঙ্গবন্ধু তাদের বোঝাতে পেরেছিলেন- মুক্তির জন্য বাঙালিদের চাই স্বাধীন ভূখণ্ড। কেবল পৃথক পতাকা ও মানচিত্র নয়, তাদের লড়তে হবে ভালোভাবে বাঁচার জন্য। মুক্তির জন্য। স্বাধীনতার পর তিনি ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেছিলেন। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষকদের সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষক-মজুরদের জীবন বদলে যাচ্ছে। সচ্ছল, উন্নত জীবন তাদের কাছে আর স্বপ্ন নয়। বঙ্গবন্ধু যৌবনে কৃষকদের জন্য যেসব দাবি উত্থাপন করেছিলেন, তার বাস্তবায়ন চলছে। তবে এখনও কৃষির স্বার্থে, কৃষকের স্বার্থে আন্দোলনের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। এ মহৎ কাজে যারা এগিয়ে আসবেন, তাদের জন্য উজ্জ্বল ধ্রুবতারা বঙ্গবন্ধু এবং অবশ্যই তাঁর কাজের ধরন ও কৌশল।

#

০৫.০১.২০২০ পিআইডি

ফিচার